এই লেখাটি "দ্য ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট" এর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মানসিকভাবে অসুস্থ শিশুর দূর্ভাগ্যের কথা

আয়শা আমিন
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী
(প্রশিক্ষণরত)

১২ বছরের নয়ন দাড়িয়ে আছে রান্নাঘরের দরজায়। হাতে একটি চা চামচ। সে বারবার চিৎকার করে মায়ের কাছে বলছে "তুমি যদি আমাকে বাবার ঐ কলমটা না দাও তবে আমি জানালা দিয়ে এক্ষুনি চামচটা ফেলে দেব, আর কিছুক্ষণ পরপর মুখ দিয়ে অদ্ভুত রকমের কতগুলো শব্দ বের করছে। নয়নের মা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষিকা এবং বাবা একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। বাবা নয়নের সমস্যাটিকে খুব একটা ভাল বোঝেন না। কিন্তু মা তার ছেলেকে নিয়ে গত সাত বছর ধরে বিভিন্ন স্পেশালিষ্ট, ডাক্তার, নিউরোলজিষ্ট, সাইকিয়াট্রিষ্ট দেখাচ্ছেন। কেউই পরিস্কারভাবে নয়নের সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠার কথাটি বলছেন না। সকলেই ঔষধ, উপদেশ আর থেরাপীর কথা বলছেন। এদিকে ছেলে দিন দিন বড় হচ্ছে। কিন্তু তার আচার-আচরণগুলো একদম ছোট-বাচ্চাদের মতো আবার কখনও কখনও খুব অদ্ভুত রকমের। তবে সে মাঝে মাঝে স্বাভাবিকভাবেও আচরণ করে। এসব দেখে মায়ের মনে মাঝে মাঝে আশার সঞ্চার হলেও যখনই নয়ন এ ধরনের কীর্তিকলাপ শুরু করে তখনই তার মাথা ঠিক থাকে না। ভদ্র মহিলা মাঝে মাঝে নিজেও খুব সুন্দর করে নয়নকে সামলান। আবার কখনও অসহ্য হয়ে নয়নকে মারধর করেন; বাথরুমে আটকিয়ে রাখেন, খেতে দেন না। প্রায়ই অস্থির হয়ে উঠেন ওকে নিয়ে। এজন্য নয়নের ওষুধও চলছে রীতিমতো, কিন্তু এতোদিনেও নয়ন ভালো হয়ে ওঠছেনা।

এ ঘটনাগুলো এতো তীব্র হয়েছে গত ২/৩ বছর ধরে। মা তার ডাক্তারের সাথে আলাপ আলোচনা করে জানতে পারেন নয়ন গায়েবী আওয়াজ শুনতে পায়, এক কাজ বারবার করতে তার ভাল লাগে, নিজেকে বড় করে দেখতে ও শুনতে তার ভাল লাগে। পড়তে ভাল লাগেনা, শুধু আম্মুর আদর নিতে ভাল লাগে, অর্থহীন কথা বলতে ভাল লাগে। প্রায়ই বাড়ীতে মেহমান এলে একটা অস্বস্থিতে পড়তে হয় এবং হতে হয় হাজারো মানুষের প্রশ্নের সম্মুখীন। ওকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। একমাত্র ছেলে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল তাদের। কিন্তু স্বপ্নতো দূরের কথা স্বাভাবিক আবচর আচরণই ওর দ্বারা সম্ভব হয় না। তেমনি একদিন ইউনিভার্সিটির একজন কলিগ কথায় কথায় বলে ফেলল, ও আপনার ছেলেতো মেন্টালি সিক।" ঐ দিন নয়নের মায়ের মনে হলো 'বিষ খেয়ে মরে যাই'। 'আর নয়তো কোন গাড়ি এসে রিক্সাটাকে চাপা দিক'। 'আজ এ খানেই সব যন্ত্রণার শেষ হয়ে যাক'। উপরের এ আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম নয়ন এক ধরনের জটিলতম মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং সাথে সাথে তার মা ও একটি তীব্র মানসিক চাপে ভুগছেন। হতে পারে তার সমস্যাটি শিশুকালীন স্কিজোফ্রেনিয়া যার ফলে তার শিক্ষণে প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে। আবার অনেক সময় শিক্ষণে প্রতিবন্ধকতার দরুণ অনেক সময় স্কিজোফ্রেনিক আচরণগুলো হতে পারে এবং এই সকল শিশুকে ম্যানেজ করতে গিয়ে পরিবারেও এক ধরনের অস্থিরতা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়, যার প্রভাব এই অসুস্থ শিশুর উপরই পড়ে। অথচ এইদিকে তার সমস্যাটি নিয়ে ডাক্তার এবং পরিবার সঠিক উপায়ে ম্যানেজ করতে না পারার দরুণ তার সমস্যাটি দিন দিন প্রকট হয়ে দাড়াচ্ছে। এখন দেখা যাক কি কি কারণে নয়ন আর তার মায়ের কষ্টগুলো চক্রাকারে হচ্ছে।

(১) চিকিৎসার হয়রানি ঃ ডাক্তার এবং সাইকিয়াট্রিষ্ট এখন পর্যন্ত কেউই তার ছেলের ভালো হয়ে উঠার কথা পরিস্কার করে বলছেন না। শারীরিক চিকিৎসাই যে একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি নয় তাও জানানো হয় না। তারা মুখে যে উপদেশ বা থেরাপী চালাচ্ছেন বলে বলেন যা বাস্তবে খুব একটা কার্যকরীও হচ্ছে না।

(২) পুর্ণবাসনকেন্দ্রের অপ্রতুলতা ঃ নয়নের এই সমস্যা ম্যানেজ করার জন্য প্রয়োজন এমন কোন পুর্ণবাসনকেন্দ্রের, যার মাধ্যমে সে তার স্বাভাবিক জীবনের কাজকর্ম নিজে হাতে করতে পারে। (যেমন– নিজের হাতে খাওয়া) এবং মোটামুটি ভাবে সামাজিক আচরণগুলো করে চলতে পারে। এর পাশাপাশি এমন কিছু কাজকর্ম শেখা, যেমন– কিছু পরিমানে স্বাবলম্বী হওয়া। যা কিনা Occupational therapy মাধ্যমে সম্ভব। তার খুবই অপ্রতুলতা রয়েছে।

(৩) পারিবারিক সহযোগিতার অভাব ঃ নয়নের সমস্যার জন্য তার বাবা মায়ের মধ্যে যে পরিমান পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন তার বড়ই অভাব রয়েছে। যার জন্য নয়নের মায়ের উপর প্রচন্ড চাপ পড়ছে। সময়ে তিনি উদ্বিগ্নতায় দিশেহারা হয়ে যান আবার আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করেন। ফলে নিজের অজান্তেই নয়নের উপর করে ফেলেন পাশবিক নির্যাতন।

(৪) সামাজিক সহযোগিতার অভাব ঃ নয়ন ও তার পরিবারের প্রতি আশেপাশের প্রতিবেশীদের আচরণ রূঢ় হওয়ায় তাদের পরিবারটি কোনভাবেই সহমর্মিতা বা কোন সামাজিক সহযোগিতা না পাওয়ায় একই সমাজে থেকে আলাদাভাবে এক কোনে বসবাস করতে হচ্ছে যা কিনা তাদের জন্য খুবই করুণ ও বেদনা দায়ক।

(৫) সঠিক শিক্ষা ও আন্তরিকতার অভাব ঃ আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে নয়নদের পরিবারের মতো অনেক পরিবারেই মানসিক রোগকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে আচরণ করার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নিদেনপক্ষে শূন্যের কোটায়। যার ফলে নয়নের মা প্রায়ই সহানুভূতির পরিবর্তে সামাজিক কুটক্তির শিকার হচ্ছেন।

(৬) পিতামাতার প্রত্যাশা ঃ নয়নের মা তার ছেলের সমস্যা কোন কোন সময় সামলাতে পারেন। কিন্তু এক সময় এসে তারও মন মানে না। আশা হয় আর দশটা ছেলের মতো তার ছেলেও এক সময় সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবে। আর সুন্দরভাবে লেখাপড়া করবে। এ চিন্তাগুলো মাথায় এলেই অরুনা তার ছেলেকে লেখাপড়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন যা কিনা নয়নের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই মায়ের এই স্বাভাবিক প্রত্যাশাও নয়নের ভালো থাকার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৭) চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর অভাব ঃ একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী নিখুঁতভাবে সমস্যার বিশ্লেষণ করে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়ার কথা কিন্তু তাদের অপ্রতুলতার দরুণ তারা এই সেবা গ্রহণ থেকে নয়ন ও তার পরিবার বঞ্চিত হচ্ছেন এবং সমস্যাটি দিন দিন জটিলতর হচ্ছে।

নয়নের এ সকল সমস্যার অন্তরায়গুলো আমরা কিভাবে পার হতে পারি। একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নয়ন ও তার পরিবারকে সঠিক সহায়তা দিতে পারেন। নয়নের সমস্যা আসলেই মনোবৈজ্ঞানিক না স্নায়ুগত, না জেনেটিক তা প্রথমে একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারী টিমের সহযোগিতায় মূল্যায়ন করা উচিত। তার সমস্যা আসলেই সম্পূর্ণ ভাল হবে কিনা তা সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। নয়নের জন্য পুর্ণবাসন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও সঠিক ভাবে Occupational therapist এর ব্যবস্থা করা যাতে স্বাভাবিক জীবনের কাজকর্মও বিশেষ কিছু কাজ যেন সে শিখতে পারে। এবং লেখাপড়াই যে একমাত্র ভরসা নয় সে বিষয়ে তাকে নতুন করে ভাবতে শেখানো। নয়নের বাবা মায়ের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা যাতে তারা তাদের ও নয়নের সমস্যাকে সঠিক ভাবে ম্যানেজ করতে পারেন। শুধু তাই নয় একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী তার দক্ষতা দিয়ে এ ধরনের শিশুদের অর্ন্তনিহিত আবেগ অনুভূতির উন্মোচন করে তার সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেন। শুধু তাই নয় দেখা যার এসকল শিশুদের ক্ষেত্রে পরিবারে অনেক সময় অনেক ধরনের অশান্তি অথবা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যার ফলে এধরনের শিশুরা তাদের স্বাভাবিকভাবে আচরণ করতে আবার পিছিয়ে যায়। আবার পারিবারিক পরিবেশও আরো বিষময় হয়ে উঠে এবং সমস্যাগুলো দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। এক্ষেত্রেও একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর অবদান অতুলনীয়। তাঁর কাজ হয়ে দাড়ায় পরিবারের সদস্যদের আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যাতে অসুস্থের উপর তা যতটা সম্ভব প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

তাই আমাদের পূর্ণবয়স্ক শিক্ষিত সমাজের দায়িত্ব হওয়া উচিত তাদের সাথে যতটা সম্ভব শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করার। ইদানিং বাংলাদেশে মানসিকভাবে অসুস্থ শিশুদের নিয়ে আমাদের জ্ঞানীগুণী জন বেশ ভাবছেন। আশা করবো পারিবারিক এই অস্থিরতা এবং আমাদের বড়দের আবেগগুলো যেন তাদের সমস্যা দীর্ঘায়ণের কারণ না হয়ে দাড়ায়। কারণ পশ্চিমা দেশের অনেক গবেষণাতে দেখা গেছে পারিবারিক আবেগের এই অস্থিরতা এবং বহিঃপ্রকাশের দরুণ মানসিকভাবে অসুস্থ পুর্ণবয়স্ক এবং শিশু উভয়েরই সমস্যা আবার দীর্ঘায়ণ এবং পুনরায় সমস্যা হওয়ার কারণ হয়ে দাড়ায়। এবং এর ফলে অসুস্থ এবং পরিবার চক্রাকারে সমস্যার মধ্য দিয়ে ভুগতে থাকে। তাই একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর সহায়তা নিয়ে আমরা আমাদের এই সেবা গ্রহণের সুযোগ নিতে পারি। শুধু একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীই কেন আমাদের নিজেদেরও কি উচিত নয় নিজেরা স্বশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সাহায্য করা। আর নয়তো এরাই এক সময় হয়ে দাড়াবে আমাদের এবং তাদের নিজেদের দূর্ভাগ্যের কারণ।

লেখক পরিচিতি

আয়শা আমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের এম. ফিল দ্বিতীয় পর্বের একজন প্রশিক্ষণার্থী। তিনি বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ট্রমা ভিক্টিমস (BRCT) নামক এনজিওতে কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে লেখাটির জন্য লেখক বেশ কয়েকজন রুগী এবং তাদের বাবা মায়ের সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে লিখেছেন। লেখক তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।